বৈষম্য নয় সমতা

ইমদাদ ইসলাম

বৈষম্য নিয়ে আলোচনা এখন সর্বস্তরে দানা বেঁধে উঠছে। দেশের মানুষ এখন অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বেশি সোচ্চার।রাষ্ট্রীয় নীতি হতে পারিবারিক চর্চা-সবখানেই ন্যায্যতার প্রশ্ন প্রবল হয়ে উঠছে। সবাই যারযার অবস্থান থেকে অধিকারের প্রশ্নে আপোষহীন।ছাত্র জনতার জুলাই বিপ্লব দেশের মানুষকে অধিকারের প্রশ্নে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে,কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাড়ঁ করিয়েছে। বাংলাদেশে নানা রকম বৈষম্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আয়বৈষম্য। এ ছাড়াও শিক্ষা,জেন্ডার ,সামাজিক এবং ডিজিটাল বৈষম্য দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য অন্তরায় হয়ে দাড়িঁছে।

আয়বৈষম্য বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে গেছে। ২০২২ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপের যে প্রাথমিক ফলাফলে বাংলাদেশের জনগণের আয়বৈষম্য পরিমাপক জিনি সহগের মান নির্ধারিত হয়েছে ০.৪৯৯ শতাংশে।গ্রাম এলাকায় ০.৪৪৬ এবং শহরাঞ্চলে ০.৫৩৯। গিনি সহগ হচ্ছে একটি দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিসংখ্যানগত পরিমাপ। গিনি সহগ শূন্য)০ (সম্পূর্ণ সমতা প্রকাশ করে। আর এ সহগ ১ হলে তা সম্পূর্ণ অসমতাকে প্রকাশ করে।কোনো দেশের বৈষম্য যখন গিনি সহগ অনুযায়ী ০.৫০০ হয়, তখন ওই দেশটি উচ্চমাত্রার বৈষম্যে ভোগে। ০.৪৯৯ গিনি সহগ নিয়ে বাংলাদেশ এখন উচ্চমাত্রার বৈষম্যের কাছাকাছি রয়েছে। এর ফলে যারা আয়ের নিম্নসীমায় আছেন, তাদের সম্পদের পরিমাণ আগের চেয়ে আরো কমে গেছে যা ভোগ বৈষম্যকেও বাড়ছে।এর অর্থ হলো ২০২৪ সালে আয় ও সম্পদবৈষম্য বাড়তে বাড়তে বাংলাদেশ এখন একটি ‘উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশে’ পরিণত হয়েছে।বাংলাদেশ ২০১৮ সাল থেকে ‘স্বল্পোন্নত দেশের’ ক্যাটাগরি থেকে ‘উন্নয়নশীল দেশের’ ক্যাটাগরিতে উত্তরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়ার সফল সমাপ্তি হলে ২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে।এর আগে ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংকের ‘নিম্ন আয়ের দেশ’ পর্যায় থেকে বাংলাদেশ ‘নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ’-এ উত্তীর্ণ হয়েছিল।বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.১৩ শতাংশে উন্নীত হয় যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিলো ৫.৮ শতাংশ। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি পাকিস্তানের চেয়ে ৬৫ শতাংশ বেশি। কিন্তু মাথাপিছু জিডিপি একটি গড় সূচক। মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে আয়বৈষম্যও বাড়তে থাকা ইতিবাচক নয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ওয়েলথ এক্সের ওয়ার্ল্ড আলট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট-২০১৮ অনুযায়ী ২০১২ থেকে ২০১৭ এ পাঁচ বছরে ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলোকে পেছনে ফেলে বিশ্বে এক নম্বর স্থান দখল করেছিলো বাংলাদেশ। এ সময়ে দেশে ধনকুবেরের সংখ্যা বেড়েছে বার্ষিক ১৭.৩ শতাংশ হারে।

বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবে ২০১৪ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে আয় বৈষম্য ছিল সবচেয়ে কম। আইএমএফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত আড়াই দশকে দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আয় বৈষম্য ব্যাপক হারে বেড়েছে এবং ভুটান, মালদ্বীপ ও নেপালের আয় বৈষম্য কমেছে । বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের নীচের দিকের ৫০ শতাংশ মানুষের কাছে আছে দেশের মোট আয়ের মাত্র ১৮ শতাংশ । অন্যদিকে শীর্ষ ৫ শতাংশের হাতে আছে মোট আয়ের ৩০ শতাংশ। ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী, মোট আয়ে দারিদ্র্যসীমার সবচেয়ে নীচের দিকে থাকা ৪০ শতাংশ মানুষের অংশ ছিল ২১ শতাংশ আর সবেচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর অংশ ছিল ২৭ শতাংশ। বিবিএসের খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০২২ সালে দেশে পরিবার প্রতি মাসে গড়ে আয় ছিলো ৩২ হাজার ৪২২ টাকা যা ২০১৬ সালে ছিলো ১৫ হাজার ৯৮৮ টাকা। ছয় বছরের ব্যবধানে আয় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। অন্যদিকে ২০২২ সালে গড়ে পরিবার প্রতি মাসিক ব্যয় ছিলো ৩১ হাজার ৫০০ টাকা যা ২০১৬ সালে ছিলো ১৫ হাজার ৭১৫ টাকা। ২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার ছিলো ১৮.৭ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে ছিলো ২৪.৩ শতাংশ।সর্বশেষ জরিপ অনুসারে, ২০১৬ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে প্রতি বছর দারিদ্র্য হ্রাসের হার ছিল দশমিক ৯৩ শতাংশ। প্রতি বছর দারিদ্র্য হ্রাসের হার কমলেও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ধনী- গরীবের জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমাজের উচ্চবিত্তরা সহজেই যে সেবাটি নিতে পাছেন সেই সেবাটি অর্থের অভাবে নিম্নবিত্তরা প্রয়োজনীয় সেই সেবাটি নিতে পাছেন না। সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক শিক্ষার অনুপস্থিতিতে সমাজে বিভক্তিসহ জাতিসত্তার সুষম বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। শিক্ষাকাঠামোয় গ্রাম--শহর, ধনী -দরিদ্র, কারিগরি -মাদ্রাসা, বাংলা-ইংরেজি বা সরকারি-বেসরকারি-নানা ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় বিভেদের দেয়াল ক্রমেই চওড়া হয়েছে। অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণা প্রশ্রয় পেয়েছে। নগরকেন্দ্রিক এলিট শ্রেণির ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া ও বিদেশি সিলেবাস শিক্ষার্থীর আচরণে বিজাতীয় ভাবধারার ছাপ স্পষ্ট করেছে। দেশে কম-বেশি দেড়’শ টির মতো ইংরেজি মাধ্যম স্কুল আছে। এসব স্কুলে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। এছাড়াও ইংরেজি ভার্সন স্কুলের সংখ্যাও কম-বেশি এক’শ।

তাদের শিক্ষার সাথে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক পার্থক্য রয়েছে।এছাড়াও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আরও একটি শিক্ষা ব্যবস্থা হয়েছে,সেটা হলো মাদ্রাসাশিক্ষা ব্যবস্থা । উপমহাদেশে প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায় ১৭৮০ সালে। ১৯৭০ সালের

আগে দেশে ২ হাজার ৭২১টি মাদ্রাসা ছিল। আর ২০০৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ হাজার ১৫২টিতে। এখন তা কম-বেশি ষাট হাজার । ৫০ লাখেরও বেশি ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে এসব প্রতিষ্ঠানে। ৮২টি কামিল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্সও চলমান আছে। অথচ এ বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন, সময়োপযোগী শিক্ষার সুযোগ নেই বললেই চলে। কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮ হাজার ৬৭৫।

বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠা আমাদের যুবকরা মেধা ও মননে ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারায় গড়ে উঠছে। যা সমাজে অসাম্য ও বিভক্তির সৃষ্টি করছে।বর্তমানে কারিগরি শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে।কম-বেশি ১২ লাখ শিক্ষার্থী এখন বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে। ৫ বছর আগেও এ সংখ্যা ৯ লাখের বেশি ছিল না। ১৫ বছর আগেও কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণ ২ শতাংশেরও কম ছিল। এখন তা বেড়ে ২১ শতাংশ হয়েছে। দক্ষতামূলক কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি সরকারেরও নজর বেড়েছে। স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকায় ছাত্রছাত্রীর আগ্রহও বাড়ছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা শ্রেণি -বৈষম্য তৈরি করে রেখেছে, যা সবার শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। দরিদ্র কিংবা কম সামর্থ্যবান অভিভাবকের সন্তান ধনী পরিবারের সন্তানের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। ঢাকায় বেসরকারি সাধারণ বিদ্যালয়ে কিংবা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের তুলনায় সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা অনেক কম ব্যয়বহুল। কিন্তু প্রশ্নটা শিক্ষার মান নিয়ে। বিত্তবানের জন্য অনেক সুযোগ আছে। এরা প্রতিষ্ঠানকে পাশ কাটিয়ে নিজের উদ্যোগে সন্তানকে প্রস্তুত করছে। উদ্দেশ্য, বিদেশে দক্ষ কর্মী বা পেশাদার হিসাবে কাজ করতে পারা। কোচিং-গাইডের দাপট, শ্রেণিকক্ষে সক্রিয়তার অভাব ও মূল্যবোধের অবক্ষয় শিক্ষার মানকে হুমকির মধ্যে ফেলে এবং বৈষম্য সৃষ্টি করে। সরকারি-বেসরকারি বা গ্রাম-শহর ভেদে সুযোগের বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবহারিক পরীক্ষা, অবকাঠামো সুবিধা, মানসম্পন্ন শিক্ষকের সমর্থন-সবই নগরভিত্তিক। শিক্ষাবাণিজ্য, দুর্নীতি ও অব্যবস্থা শিক্ষাসেবার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য নিরসন করা না গেলে কখনোই সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজে বিভক্তি তৈরি করায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টিকে উন্নয়নের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে সমস্য হচ্ছে।

জেন্ডার বৈষম্যের অন্যতম কারণ নারী-সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস। তাই মনে করা হয় শিক্ষার মাধ্যমেই কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমেই জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব।নারীর ক্ষমতায়ন মানুষেরই ক্ষমতায়ন। আমাদের সংবিধান সকল মানুষের ক্ষমতায়নের কথা বলেছে। সকল মানুষকে সমান অধিকার দেওয়ার কথা বলেছে। সংবিধান সমুন্নত রাখতে, মানুষের অধিকার সমুন্নত রাখতে সকল প্রকার বৈষম্যের মূলোৎপাটন করতে রাষ্ট্র এবং নাগরিককেই দায়িত্ব নিতে হবে। সমাজে জেন্ডার সমতায়ন সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণার বিস্তৃতি ঘটলে অনানুষ্ঠানিকভাবে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের ধারণা শিশুদের মধ্যে বিকশিত হবে। সমাজে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতারোধ এবং নারীর ক্ষ মতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করতে হবে।কারন জেন্ডার বৈষম্য রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়াকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

রক্তস্নাত জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে গঠিত সরকারের লক্ষ্য একটি আধুনিক, মানবিক ও দক্ষ সমাজ গঠন ।ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে মর্যাদাশীল ও উন্নত নতুন দেশ গঠনের একটা বড় ধরনের চাহিদা জনমানসে তৈরি হয়েছে। জনগন এখন আর বিদেশনির্ভর থাকতে চাইছে না । আত্নসন্মান নিয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায় বর্তমান যুব সমাজ।সকল বৈষম্যের অবসান ঘঠিয়ে একটি নতুন মানবিক দেশ গঠনই মূল লক্ষ্য ।

#

পিআইডি ফিচার